

# আমাদের তরুণরা মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে কেন লেখেন না?

-জুবায়ের ইবনে কামাল

মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক সাহিত্য নিয়ে কথা বলতে গেলে অনেক ধরনের কথা মাথায় কিলবিল করতে থাকে। আদতে সাহিত্যে মুক্তিযুদ্ধকে জোরালো ভাবে ব্যবহার করার বিষয়টি সেভাবে পরিলক্ষিত হতে দেখা যায় না। সাধারণভাবে এই কথার সঙ্গে আপনি দ্বিমত পোষণ করে বসতে পারেন। প্রতি বছর ঘোষণা দিয়ে যে সংখ্যক মুক্তিযুদ্ধের বই প্রকাশিত হয়, তাতে সাহিত্যে মুক্তিযুদ্ধের উল্লেখ নিয়ে উদাসীনতার অভিযোগ করলে, তার সঙ্গে একমত হবার কথাও নয়। কিন্তু তলিয়ে ভাবলে দেখা যায় ভিন্ন কিছু। সাহিত্য কোন সরল রৈখিক পথের নিদর্শন নয়। আর তাই এটিকে একদৃষ্টিতে দেখে কোন কিছু বিচার করলে অন্তত স্বাৰ্বজনীন কোন সিদ্ধান্ত নেয়া যাবে না বলেই মনে হয়।

আমরা একটা কথা অনেক বেশি শুনেছি, তা হলো- সাহিত্য হলো সমাজের দর্পন। এখন দর্পন হলো আমাদের বিশ্বস্ত একটি মাধ্যম। কোন আয়নায় যখন আপনি আপনার ছব্ব প্রতিবিম্ব দেখেন, তাকে আপনি যথেষ্ট বিশ্বাস করেন এবং সে অনুযায়ী নিজের আকারের ব্যাপারে ধারণা নেন। কখনো কি আপনি ভেবেছেন, আয়নায় আপনাকে ভুল দেখাচ্ছে। সাহিত্য কিন্তু সমাজের হয়ে দর্পনেরই কাজ করে। আর তাই সমাজের ছায়া আপনি যদি সাহিত্য নামের দর্পনে সঠিক ভাবে প্রতিবিম্ব করতে না পারেন, তবে তাকে অন্তত সমাজের প্রতিফলিত সাহিত্য বলা যায় না। মনে প্রশ্ন আসতে পারে, তবে কি সাহিত্যে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস উঠে আসেনি? কিন্তু তা নয়। আগেই বলে হয়েছে, সাহিত্য কোন সরল রৈখিক পথের নিদর্শন নয়। তাই খুব দ্রুত সিদ্ধান্ত না নিয়ে চলুন তলিয়ে ভাবা যাক।

১৯৭১ সালের মার্চের শেষ সপ্তাহে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলো। সেই যুদ্ধের লেখক ও চলচিত্র নির্মাতা জহির রায়হান নির্মান করেন প্রামাণ্য চিত্র ‘স্টপ জেনোসাইড’। বলা চলে এটিই প্রথম মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে নির্মিত চলচিত্র (ভিজুয়াল ওয়ার্ক)। এটির পাশাপাশি সে বছর কিন্তু জহির রায়হান আরো একটি প্রামাণ্য চিত্র নির্মান করেছিলেন। যার নাম- ‘এ স্টেট ইজ বর্ন’। একই বছরে তৈরি করার পরেও খুব বেশি মানুষ তা জানে বলে মনে হয় না। অথচ ১৯৭১ সালেই এর বাইরে আরো দু’টো ডকুমেন্টরি ফিল্ম তৈরি করা হয়েছিলো। আলমগীর কবিরের ‘লিবারেশন ফাইটস’ ও বাবুল চৌধুরীর ‘ইনোসেন্ট মিলিয়নস’। কিন্তু আদৌ কি সেসব সিনেমা নিয়ে চর্চা হয়?

যদি আমরা আমাদের বিষয়ের দিকে তাকাই, তরুনরা মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে আদৌ কাজ করছেন না কেন, তবে দেখতে পাই আদতে সেসময়কার তরুনরা সৃষ্টিশীল কাজে মুক্তিযুদ্ধকে নিয়ে আসতে বেশ আগ্রহী ছিলেন। জহির রায়হান যখন স্টপ জেনোসাইডের মত চলচিত্র নির্মাণ করছেন, তখন তিনি ছত্রিশ বছরের তরুন। তিনি যখন ভাষা আন্দোলনকে ভিত্তি করে তিনি তারও আগে নির্মাণ করেছিলেন ‘জীবন থেকে নেয়া’ নামের চলচিত্রটি। তরুন হিসেবে জহির রায়হান মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে সমানে লিখেছেন এবং চলচিত্রেও হাত দিয়েছিলেন।

মুক্তিযুদ্ধের পর ১৯৭২ সালে চাষী নজরুল ইসলাম তৈরি করেন ‘ওরা ১১ জন’ সিনেমাটি। তখন তাঁর বয়স ছিলো মাত্র ৩০ বছর। অথবা আমরা যদি এই সময়ের কোন চলচিত্রকারকে সামনে রাখি তবে প্রায় একই ফলাফল পাবো। ২০০৭ সালে নির্মাতা মোস্তফা সরওয়ার ফারুকী যখন স্পার্টাকাস’৭১ নামের সিনেমাটি তৈরি করেন তখন তার বয়স মাত্র ৩৪ বছর। সম্প্রতি মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে প্রথম এনিমেশন ফিল্ম তৈরি করেছেন তরুন নির্মাতা ওয়াহিদ ইবনে রেজা। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধকে ঘিরে সৃষ্টিশীল কাজে তরুনদের এত অগ্রগামী ভূমিকা থাকলেও আদতে কি মনে রাখার মত অনেক কাজ আমরা দেখতে পেয়েছি? আন্তর্জাতিক বার্তা সংস্থা বিবিসি বলছে, স্বাধীনতার এত বছর পরেও মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচিত্রের সংখ্যা ৫০ থেকে কিছুটা বেশি।

সিনেমা থেকে এবার বরং বইয়ের দিকে তাকানো যাক। এটি ঠিক যে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে এখন পর্যন্ত অসংখ্য বই বের হয়েছে। এমনকি প্রতি বছর বইমেলায় শ’খানেক বই প্রকাশিত হয় যা কোন না কোন ভাবে স্বাধীনতা সংগ্রামকে ভিত্তি করে লেখা। কিন্তু সেই আগের কথায় ফেরা যেতে পারে। আদতে এসবের মধ্যে কতগুলো বই মনে রাখার মত। কিংবা বিশ্ব সাহিত্যে ছড়িয়ে দেয়ার মত কতগুলো বইকে মানসম্মত বলে ধরা যাবে। এত এত লেখার পরেও কেন এরকম ফলাফল? আর একবিংশ শতাব্দীর এই সময় এসে দাঁড়িয়ে আদৌ কি তরুনরা কেউ মুক্তিযুদ্ধকে নিয়ে লেখেন? এসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজার আগে চলুন একটু পেছনের দিকে ফেরা যাক।

১৯৭৪ সালে প্রকাশিত হয়েছিলো রফিকুল ইসলাম বীর উত্তম রচিত A Tale of Millions নামের বইটি। অথচ ‘লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে’ নামে বইটি বাংলায় প্রকাশিত হয় ১৯৮১ সালে। একটি ইংরেজি বইয়ের বাংলা সংস্করণের সময় লেগেছে সাত বছরের বেশি। আশির দশকে কিছু লেখা হলেও মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে মূলত সাহিত্যে চর্চা শুরু হয় নব্বই দশকের মাঝামাঝি সময়ে। নব্বই দশক শেষে

দেখা যায় সেসময়কার তরুণ সাহিত্যিকরা তাদের লেখায় নিয়মিত ভাবে মুক্তিযুদ্ধকে স্বাক্ষী রেখে গেছেন। নব্বই দশকে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে সাহিত্য চর্চায় একটি বড় বিপ্লব লক্ষ্য করা যায়। বাংলাদেশের সীমানার গন্ডি পেরিয়ে ভারতের পশ্চিম বঙ্গের সাহিত্যে সেসময়কার জনপ্রিয় সাহিত্যিকরাও লেখায় আনতে শুরু করেন বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিভিন্ন প্রেক্ষাপট। তাই কাটাতার পেরিয়ে দুই বাংলার মাঝেই নতুন করে সৃজনশীল চর্চার বিষয় হয়ে ওঠে ১৯৭১ সালে সংঘটিত মুক্তিযুদ্ধ।

সেসময় অনেকেই লিখেছিলেন মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক গল্প উপন্যাস। হুমায়ূন আহমেদ ১৯৮৬ সালে প্রকাশ করেন ‘আগুনের পরশমণি’ বইটি। সেবছরই প্রকাশিত হয় আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের বহুল আলোচিত ‘চিলেকোঠার সেপাই’ উপন্যাসটি। তাছাড়া মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বই ‘একাত্তরের দিনগুলি’। জাহানারা ইমামের বাইরেও সে বছর প্রকাশিত হয় শওকত ওসমানের ‘কালরাত্রি খন্ডচিত্র’ নামক বইটি। বোঝাই যাচ্ছে একই বছর বেশ গুরুত্বপূর্ণ চার-চারটি বই বেরিয়েছিলো যা এখনো টিকে আছে স্বমহিমায়। আর উভয়ই মুক্তিযুদ্ধকে আশ্রয় করে লেখা। চিলেকোঠার সেপাই উনসত্তরের গণ অভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে নির্মিত গল্প। ১৯৯৩ সালে প্রকাশিত হয় হুমায়ূন আহমেদের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক বই ‘১৯৭১’। তার পরের বছর মুহম্মদ জাফর ইকবাল লেখেন বিখ্যাত ‘আমার বন্ধু রাশেদ’ বইটি। পরবর্তী বছর অর্থাৎ ২০০০ সালে প্রকাশিত হয় আনিসুল হকের লেখা ‘চিয়ারি বা বুদু ওরাও কেন দেশত্যাগ করেছিল’ বইটি।

পরবর্তী কয়েক বছরেও গুরুত্বপূর্ণ বেশ কিছু বই প্রকাশিত হতে দেখা যায়। ২০০১ সালে আনিসুল হক লেখেন ছোট পরিসরে মাত্র ৮০ পৃষ্ঠার বই ‘বীর প্রতিকের খোঁজে’। সেবছরই প্রকাশনা সংস্থা মাওলা ব্রাদার্স বের করে ড. সুকুমার বিশ্বাসের গবেষণা গ্রন্থ ‘অবরুদ্ধ বাংলাদেশ পাকিস্তানি সামরিকজাঙ্গা ও তার দোসরদের তৎপরতা’। মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে যে কোন গবেষণার কাজে এটি কার্যকরী একটি সহায়ক বই। এছাড়াও একই বছর প্রকাশিত হয়েছিলো জহুরুল হকের লেখা ‘নিষিদ্ধ নিঃশ্বাস’ বইটি। ২০০২ সালে বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীরের ‘জার্নাল ৭১’ বইটি প্রকাশিত হয়। তার পরের বছর অর্থাৎ ২০০৩ সালে প্রকাশিত হয় আনিসুল হকের বহুল জনপ্রিয় উপন্যাস ‘মা’। যেটি সম্প্রতি একশো তম মুদ্রনে প্রকাশিত হয়েছে। ইতোমধ্যে একাধিক ভাষায় বইটি অনুবাদ করা হয়েছে।

সেই সময়ে একই সাথে অনেক গুরুত্বপূর্ণ মুক্তিযুদ্ধের বই বের হতে দেখা যায়। কিন্তু তার পরবর্তী সময়ে সেভাবে এমন কোন বই প্রকাশিত হয়নি, যা এখনও আমরা চর্চা করি। সত্যিকার অর্থে তার ঠিক পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের রাজনীতিতে বড় ধরনের টানা পোড়েন হতে দেখা যায়। রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক এসব সংকটের কারণে মূলধারার সাহিত্যে এর বড় ধরনের প্রভাব পরেছিলো। তরুণদের মধ্যে সৃষ্টিশীল কাজে মুক্তিযুদ্ধকে নিয়ে আসার প্রবনতা ধীরে ধীরে কমতে শুরু করে। এর কারণ ছিলো সামাজিক বিভিন্ন মত ও আদর্শের সংকট। এসব সংকটকে ঘিরে তৈরি হওয়া সাহিত্যের বেশিরভাগই স্বাৰ্বজনীনতা হারিয়ে ফেলে। কিন্তু প্রশ্ন এটা উঠছে, আমাদের তরুণরা কি মূলত এই কারণেই মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে লেখেন না?

সময়ের সাথে সাথে সাহিত্যের ধরণেও এসেছে বৈচিত্র্যতা। নব্বই দশকের মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক গল্প কিংবা উপন্যাসে যেভাবে নৃশংসতার উল্লেখ পাই, পরবর্তী সময়ের বইগুলোতে যুদ্ধের তেমন একটা আঁচ পাই না। তাছাড়া গন্ডিবদ্ধ মুক্তিযুদ্ধ সাহিত্য বর্তমান প্রজন্মকে একরোখা করে দিয়েছে অনেকাংশেই। তাই মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক হাতে গোনা যেসব ভালো মানের কাজ হচ্ছে, সেসব বইগুলোতে পাওয়া যায় গাঠনিক বৈচিত্র্যতা। রাসেল রায়হানের লেখা 'অমড়াবতি' উপন্যাসটিকে মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাস হিসেবে বলা হলেও, গতানুগতিক ধারা থেকে এই বইটি বেশ আলাদা। একজনের ক্রিকেটার হয়ে ওঠার স্বপ্নের সাথে এগোতে এগোতে আমরা দেখতে পাই ইতিহাসের নির্মম সত্যকে।

তবে সত্যি বলতে যদি প্রশ্নটা আবার সামনে রাখা হয় যে, আমাদের তরুণরা মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে কেন লেখেন না? তবে উত্তরের আশায় খুঁজে পাই, বিভিন্ন সামাজিক সংকট ও রাজনৈতিক বাস্তবতার বাইরেও গতানুগতিকের এক অসামান্য আবরণ আটকে রাখে তরুণদের। যার শক্তির উৎস আমাদের অজানা। কিন্তু আশার খবর হলো, ২০০০ দশকের মাঝামাঝি থেকে এখন পর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক বইয়ের ব্যাপারে বাজারে যে ঘাটতি দেখা গিয়েছিলো, তরুণদের হাত ধরে সেসব কাটতে শুরু করেছে। গল্পকাররা তাদের রচিত গল্পগ্রন্থগুলোতে সংকলন করেছে মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে লেখা কোন গল্প। এমন একদিন সময় হয়তো আসতে চলেছে, তরুণরা মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে কেন লেখেন না – এই প্রশ্নই হয়ে উঠবে অবান্তর। আশির দশকের পরের সময়ে লেখা উপন্যাসগুলোর মত তরুণরাও লিখবে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে চিরায়ত বই।